وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِىۡ‌ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا
مَا رَحِمَ رَبِّىۡ‌ؕ اِنَّ رَبِّىۡ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الۡمَلِكُ ائۡتُوۡنِىۡ
بِهٖۤ اَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِىۡ‌ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا
مَكِيۡنٌ اَمِيۡنٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجۡعَلۡنِىۡ عَلٰى خَزَآئِنِ الۡاَرۡضِ‌ۚ اِنِّىۡ حَفِيۡظٌ
عَلِيۡمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوۡسُفَ فِى الۡاَرۡضِ‌ۚ يَتَبَوَّاُ مِنۡهَا حَيۡثُ
يَشَآءُ‌ ؕ نُصِيۡبُ بِرَحۡمَتِنَا مَنۡ نَّشَآءُ‌ وَلَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٥٦﴾
وَلَاَجۡرُ الۡاٰخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ﴿٥٧﴾ وَجَآءَ
اِخۡوَةُ يُوۡسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهٗ مُنۡكِرُوۡنَ ﴿٥٨﴾ وَ
لَمَّا جَهَّزَهُمۡ بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ائۡتُوۡنِىۡ بِاَخٍ لَّكُمۡ مِّنۡ اَبِيۡكُمۡ‌ۚ اَلَا
تَرَوۡنَ اَنِّىۡۤ اُوۡفِى الۡكَيۡلَ وَاَنَا خَيۡرُ الۡمُنۡزِلِيۡنَ ﴿٥٩﴾ فَاِنۡ لَّمۡ تَاۡتُوۡنِىۡ
بِهٖ فَلَا كَيۡلَ لَكُمۡ عِنۡدِىۡ وَلَا تَقۡرَبُوۡنِ ﴿٦٠﴾ قَالُوۡا سَنُرَاوِدُ عَنۡهُ
اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوۡنَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتۡيٰنِهِ اجۡعَلُوۡا بِضَاعَتَهُمۡ فِىۡ
رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَعۡرِفُوۡنَهَاۤ اِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰٓى اَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُوۡنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوۡۤا اِلٰٓى اَبِيۡهِمۡ قَالُوۡا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا
الۡكَيۡلُ فَاَرۡسِلۡ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكۡتَلۡ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿٦٣﴾

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়—আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) বাদশাহ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল ঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (৫৭) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে। (৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল ঃ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল ঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই হবে। (৬২) এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও — সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত ঃ তারা পুনর্বার আসবে। (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বললঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন; যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল ঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না—যাতে আযীয ও বাদশাহ্র মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يُزَكُّوۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ‌ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ

অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্ তাআলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ‌ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ, তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবী করো না। আল্লাহ্ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহ্ভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয় ; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা—অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসেমুতমায়িন্না' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না; বরং আল্লাহ্ তাআলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর একথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুওয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার ঃ আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব-মনকেই لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে ; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে সম্মান-সমাদর করলে, অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এর চাইতে অধিক মন্দ

দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে-ই এই ধরনের সাথী।—(কুরতুবী অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এর কসম খেয়েছেন ঃ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল-ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে- يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيٓ إِلٰى رَبِّكِ এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায় أَمَّارَةٌ بِالسُّوٓءِ দ্বিতীয় জায়গায় لوامة এবং তৃতীয় জায়গায় مطمئنة বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে أَمَّارَةٌ بِالسُّوٓءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لوامة হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্যে তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী ; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তাআলা আপনা-আপনি পূর্ব সাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ — বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُورٌ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَّحِيمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্ তাআলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي বাদশাহ্ যখন ইউসুফ (আঃ) –এর দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন ঃ ইউসুফ (আঃ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস—যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেন ঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্র দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহ্র পয়গাম পৌঁছাল, তখন ইউসুফ (আঃ) সব কারাবাসীদের জন্যে দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন ঃ

حسبى ربى من دنياى وحسبى ربى من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره –

অর্থাৎ—আমার দুনিয়ার জন্যে আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের মোকাবেলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্যে যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

দরবারে পৌঁছে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম করেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং বাদশাহ্র জন্যে হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন ; কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। ইউসুফ (আঃ) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্রু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহ্র মনে ইউসুফ (আঃ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা করলেন।

বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন ! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার ? ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্যে মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভান্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্‌দেশী লোকদের জন্যে রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভান্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগমত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে ? ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ

اجْعَلْنِي عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমার সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে।—(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা

...রীর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে ...না ; বরং পূর্ণ হেফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ...াতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যায় জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন ...বেশী না করা। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি ...য় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

...বাদশাহ্ যদিও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর ...যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি ...তঃ তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোর্পদ করলেন না ; বরং এক বছর পর্যন্ত ...একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

...এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয় ; বরং ...তীয় সরকারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেয়া হলো। সম্ভবতঃ এই ...রের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস ...র্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এত বড় পদ ...করা উপযুক্ত ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন ঃ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী ...তকীর মৃত্যু বরণ করে এবং বাদশাহ্র উদ্যোগে ইউসুফ (আঃ)-এর ...থে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে ...বলেন ঃ তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা ...নিজ দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ্ তাআলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ-আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ...ল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, ...যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরজ করলো ঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীর কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

(১) وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ইউসুফ (আঃ) – এর উক্তিতে সৎ, আল্লাহ্ভীরু পরহেযগারদের জন্যে পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গোনাহ্ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় ; বরং ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন নিজস্ব গুণ নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন বিশেষ সরকারী পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয ; যেমন ইউসুফ (আঃ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্যে আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেননি।

মুসিলমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রাঃ)-কে বললেন ঃ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে , এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ انا لن نستعمل على عملنا من اراده যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আঃ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্যে আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফের ; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন ঃ এ আয়াতদৃষ্টে জালেম ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত

করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ্ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহ্র আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারী করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়নানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়ত বিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না—এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফের অথবা জালেমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও কাফেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না ; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফেকাহ্বিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আঃ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফের ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আঃ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আঃ)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্যে এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফেকাহ্বিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন।—(কুরতুবী)

তফসীর বাহ্রে-মুহীতে আছে ঃ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সুবিচার পদে-পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাসআলা ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোরআনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা'র অন্তর্ভুক্ত নয় ; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশতঃ না হয়।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহ্র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারী করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্র দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আঃ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং তাঁ অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়—যাবতীয় রাজকার্যই কার্যতঃ ইউসুফ (আঃ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান। —(কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আঃ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান জারী করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ অর্থাৎ, পরকালের প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্যে ইউসুফ (আঃ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইউসুফ (আঃ) পেটভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল ঃ মিসর সাম্রাজ্যে যাবতীয় ধন-ভান্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন ঃ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্যে এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করা যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্যে মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল ; ইউসুফ (আঃ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেনি। কারণ, তা আপনা থেকেই বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদগণের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত

...গৃহীত হলেও কিছুকটা গ্রহযোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এপ্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তারা বলেছেন ঃ ইউসুফ (আঃ)–এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আঃ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্য–ভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারাণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আঃ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট–বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন ; এর বেশী দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ, ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মনের কিছু বেশী হয়।

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)–এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আঃ)–এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন ঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিলেন ইউসুফ (আঃ)–এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ)–এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল। ইউসুফ (আঃ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।—(কুরতুবী, মাযহারী)

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আঃ)–কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় انكار শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنكِرُونَ এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসুফ (আঃ)–এর চিনে নেয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়— যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল ঃ আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্যে এখানে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা কোন শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র পানাহ্! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আঃ)–এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক — তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আঃ)–এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল ঃ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

এসব কথা শুনে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ)–এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্খা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুর্নবার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন ঃ

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ অর্থাৎ, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো

গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে আসতে পারে।

মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা ঃ ইউসুফ (আঃ)–এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্যসামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফেকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আঃ)–এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ ঃ ইউসুফ (আঃ)–এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বিরহব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আঃ) স্বয়ং নবী ও রসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ–যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আযীযে–মিসরের গৃহে তাঁর সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ–সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে নিজে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেয়া তো ছিল তাঁর জন্যে নেহাত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে ভ্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আঃ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যতঃ ইয়াকূব (আঃ)–এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকূব (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি ; বরং এটা তাঁর ভাইয়ের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেযমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন ঃ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوْا
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا
نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا
وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ
مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾
وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ
اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا
كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ
يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ
اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই মধ্যস্থ রইলেন। (৬৭) ইয়াকূব বললেন ঃ হে আমার বৎসগণ। সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকূবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল ঃ নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল ঃ আযীযে-মিসর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন —যাতে ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাযত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন ঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস। একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হেফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয় — যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন ঃ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا অর্থাৎ, তোমাদের হেফাযতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্র হেফাযতের উপরই ভরসা করি। وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য ও বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, ইয়াকূব (আঃ) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল ঃ مَا نَبْغِيْ অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আযীযে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশঙ্কার কারণ নেই ; আমরা পরিবারের জন্যে খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِيْ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের ما শব্দটি নেতিবাচক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল ঃ এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না— শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖ

অর্থাৎ, আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যতঃ যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকূব (আঃ)-এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন ঃ إِلَّا أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ, ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ অর্থাৎ, ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্যে কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ বেনিয়ামিনের হেফাযতের জন্যে হলফ নেয়া হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তাআলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হেফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু নয়।

মাসআলা ঃ (১) ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘণ্য গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্যে প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। (পাঁচ) একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকূব (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য যদি সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই সমীচীন।

মাসআলা ঃ (২) এখানে ইয়াকূব (আঃ) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাসআলা ঃ (৩) এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে ; যেমন ইয়াকূব (আঃ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ (৪) কোন মানুষের ওয়াদা ও হেফাযতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকূব (আঃ) বলেছেন ঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

কা'বে আহ্বার বলেন ঃ এবার ইয়াকূব (আঃ) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা ঃ (৫) যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেয়ার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক আসবাব-পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ-ভ্রাতাদের আসবাপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাবশতঃ তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ইয়াকূব (আঃ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশতঃ এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা ঃ (৬) কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকূব (আঃ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে

কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে-কেরামের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা ঃ (৭) ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ শপথ-অঙ্গীকার নেয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে — এ থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ, কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেয়া বৈধ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্যে একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্রাট তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে, কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য ঃ এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকূব (আঃ) এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে من كل عين لا مة ও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।—(কুরতুবী)

ইয়াকূব (আঃ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশতঃ ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মূর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও এরাদায় অধীন। আল্লাহ্র তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকূব (আঃ) বলেছেন ঃ

وَمَآ أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহ্র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকূব (আঃ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকূব (আঃ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্যে কোন তদবীর করতে পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইয্যতের সাথে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকূব (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে— وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

— অর্থাৎ, ইয়াকূব (আঃ) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্র দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না

এবং অজ্ঞাতবশতঃ ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম শব্দটি দ্বারা এলম অনুযায়ী আমল করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে এলম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবীরের উপর ভরসা করেননি ; বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করেছেন।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ (আঃ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন ঃ সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আঃ) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসুফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়।

(১) বদ নজর লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষ নেয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ–কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেয়া উত্তম, যেমন ইয়াকূব (আঃ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بارك الله অথবা ماشاء الله বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া–তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জা'ফর ইবনে আবুতালেবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্‌র উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। ইয়াকূব (আঃ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ও (সাঃ) তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا
وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ
الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا
جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا
كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا إِنْ
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي
نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا
كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল ঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (৭৩) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (৭৫) তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইদের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্‌র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। (৭৭) তারা বলতে লাগল ঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন ঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল ঃ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ-বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেয়ার জন্যে ইউসুফ (আঃ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِّقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। السِّقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে ملك তথা বাদশাহ্‌র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্‌র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহ্‌র আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ — অর্থাৎ, কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثم শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে—যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ –ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ – অর্থাৎ ইউসুফ–ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

— ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্যে এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্যে অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেয়ার মত জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন ঃ বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ

(আঃ)–কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং ইউসুফ (আঃ)–এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আঃ)–এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে–খাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন ঃ ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আঃ)–কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা'ই – যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আঃ)–এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব (আঃ)–এর পরীক্ষার বিভিন্নস্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ – অর্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তাআলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই মূসা (আঃ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিযির (আঃ) সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ

অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আঃ)–এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল ঃ সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ – রাজকর্মচারীরা বললঃ যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল ঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকূব (আঃ)–এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আঃ)–এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ —অর্থাৎ, সরকারী তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্যে প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ —অর্থাৎ, সব শেষে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল–মন্দ দিয়ে বলল ঃ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ

اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ — অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহ্‌র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ–ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ)– এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ — অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ

(১) وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্যে মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরী পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার জন্যে এ ধরনের পুরস্কার–ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয় লেন–দেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।—(কুরতুবী)

(২) وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ—দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্‌বিদদের মতে এ

ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।— (কুরতুবী)

(৩) كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ — থেকে জানা গেল যে, কোন শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনতঃ জায়েয হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে حيلة (হীলা) বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়— এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্যে কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া—যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না; বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী كتاب الحيل তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

إِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ — অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়—বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আঃ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তানপ্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত, সেই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকূব (আঃ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেয়ার জন্যে গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আঃ)-এর কাপড়ের নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশী নেয়ার পর ইউসুফ (আঃ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকূবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকূব (আঃ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আঃ) তার কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আঃ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আঃ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আঃ)- কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ –অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ — অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) মনে মনে বললেন ঃ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন ঃ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন।

قَالُوْا يٰٓأَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهٗ أَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهٗ إِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ
اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا
قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ
اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا
وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ
سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ
يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلّٰى
عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى
تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا
بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

(৭৯) তিনি বললেন ঃ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল ঃ পিতঃ, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। (৮৩) তিনি বললেন ঃ কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌র কসম আপনি তো ইসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন ঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا —অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্যে একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

قَالَ كَبِيْرُهُمْ —তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ —অর্থাৎ, বড় ভাই বললেন আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ —অর্থাৎ, আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্যে বলল ঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি

ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কিনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পূর্ণব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ

ইউসুফ (আঃ) এসব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

মাসআলা ঃ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তির আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়—অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হেফাযত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না-বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি—অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহারের ফিকাহ্‌বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্যে জনপদ অর্থাৎ, মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন ঃ আমার সাথে সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়। – (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

ইয়াকুব (আঃ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আঃ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব (আঃ) বিশ্বাস করতে পারলেন না ; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আঃ)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ —অর্থাৎ, তোমরা যা বলছ, সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্যে উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন ঃ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে ইয়াকুব (আঃ) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে ঃ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا — অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবত ঃ শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোটকথা, ইয়াকুব (আঃ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ — অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ ইউসুফের জন্যে বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে তাঁর চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ ইয়াকুব (আঃ)- এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيمٌ —অর্থাৎ, অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كظيم শব্দটি كظم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, ومن يكظم الغيظ يأجره الله —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা আলা তাকে বড় প্রতিদান

দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্ তাআলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন ঃ জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদমুহূর্তে إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকূব (আঃ) এ বাক্যটির পরিবর্তে يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ বলেছেন। 'বায়হাকী শোআবুল-ঈমানে' ও হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকূব (আঃ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আঃ) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ পয়গম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফেৎনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ — অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে- আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যেই এটা হযরত ইয়াকূব (আঃ) – এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার অদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আঃ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে বেশী ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করেননি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আঃ) – এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই কুরতবী প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আঃ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে খোদায়ী ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোরআনের كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ —অর্থাৎ, ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল: আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদের কথা শুনে বললেন ঃ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ —অর্থাৎ, আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না ; বরং আল্লাহ্র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا
مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا
وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ
هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾
قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۡ
قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ
اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ
الْيَوْمَ ۭ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۡ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا
بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰي وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ
وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ ۧ وَلَمَّا فَصَلَتِ
الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ
تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

(৮৭) বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বলল ঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্‌ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন ঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন ঃ আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্‌ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবান চাইতে অধিক মেহেরবান। (৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন ঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলি ঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ —অর্থাৎ, বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকুব (আঃ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল ; কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আঃ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আযীযে-মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আঃ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইয়াকুব (আঃ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোকই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। (এক) বিপদে সবর ও (দুই) ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, من بث لم يصبر অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াকুব (সাঃ)-কে সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আঃ)-এর এই অগ্নিপরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন ইয়াকুব (আঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দিব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে দিব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি

বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন ঃ এর মাধ্যমে শয়তান বন্দার নামায ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا অর্থাৎ, ইউসুফ–ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে–মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল ঃ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্যে আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجٰىةٍ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয় ; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আঃ)–এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিধি–নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ) আযীযে–মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ–

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযীযে–মিসর সমীপে।

বিনীত আরজ।

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তার বিরহ–ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান–সন্ততি। আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আঃ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল–মন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ–ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে–মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথা চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে–মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরও চিন্তা–ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্যে বলল ঃ

اِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ ঃ ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ হাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদে রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আঃ)–এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ–ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল ঃ تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ আল্লাহ্র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্ মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন।

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ, আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও

আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا — বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্যে সদ্কা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আঃ)-তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদ্কা' শব্দ বলে সত্যিকার সদ্কা বোঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেয়াকেই 'সদ্কা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্যে সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদদের উক্তি তাই।- (বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ — দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা সদ্কা-খয়রাত দাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদ্কা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল - উভয়কালই বোঝা যায়।—(বয়ানুল-কোরআন)

এছাড়া এখানে বাহ্যত ঃ আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, "আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে-মিসর ঈমানদার। তাই সদ্কাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে,বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন-এমন বলা হয়নি।—(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا — দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও খোদায়ী নেয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে **কনূদ** বলা হয়েছে إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ — **কনূদ** ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অনুগ্রহ স্মরণ না করে—শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেননি, বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার ঃ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আঃ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ — অর্থাৎ, "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না; আল্লাহ্ তাআলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নেয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ — অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কার করা হবে না।

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ, তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবারবর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ এ কারণে যে পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে, যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল ঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ — অর্থাৎ, কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকূব (আঃ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এর দূর থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকূব (আঃ)-এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন,তখন ইয়াকূব (আঃ) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জেযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জেযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়-সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কর্ম। আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জেযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ۚ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾
قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي
مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ
عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বলল ঃ পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন ঃ পিতঃ এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল।

নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ — অর্থাৎ, উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ — অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আঃ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ —অর্থাৎ, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত হবে।

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ —বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্যে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল ঃ আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي — ইয়াকুব (আঃ) বললেন ঃ আমি সত্বরই তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকুব (আঃ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা,তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন ঃ কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে—আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ — কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আঃ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলে— এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আঃ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে- اَبَوَيۡهِ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আঃ) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আঃ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন।

وَقَالَ ادۡخُلُوۡا مِصۡرَ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيۡنَ —ইউসুফ (আঃ) পরিবারের সবাইকে বললেন ঃ আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ - অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا - অর্থাৎ, পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে সেজদা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে নয়— আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্যে বৈধ ছিল না; কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَايَ مِنۡ قَبۡلُ - ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর ঃ এরপর ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দন্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহ্‌র রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আঃ)-এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন ঃ وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِيۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِيۡ مِنَ السِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِيۡ وَبَيۡنَ اِخۡوَتِيۡ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে—কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ لَا تَثۡرِيۡبَ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ তাই যে কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি।—(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ)-এর বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল—অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত পেয়েও কোন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوۡدٌ অর্থাৎ, মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আঃ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন ঃ اِنَّ رَبِّيۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ - অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন ঃ

"হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং অমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।" 'পরিপূর্ণ সৎ বন্দা' পয়গম্বরগণই হতে

পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র।—(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না ; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ —অর্থাৎ, এই কাহিনী ঐসব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্যে কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, খোদায়ী ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না)। অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবুতালেবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পন্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছেঃ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا - অর্থাৎ, কোরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেনঃ ইহুদী ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুণ আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়— আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়।

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن
تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَ
هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ
بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ
نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾
لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

(১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শেরকও করে। (১০৭) তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কেয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই—আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূর্বে ছিল? সংযম কারীদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম। তারা কি এখনও বোঝে না? (১১০) এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ — অর্থাৎ, আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্খা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্খা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُونَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোন শুভাকাঙ্খীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহ্‌র যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুঁজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তি অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ —অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শেরকের সাথে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে-কাসীর বলেন ঃ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শেরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শেরক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রিয়া (লোক দেখানে এবাদত) হচ্ছে ছোট শেরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শেরক বলা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফেকাহ্‌বিদগণের মতে শেরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মুর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কেয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى
وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা মান অথবা না

মান—আমার তরীকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাসসহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব—আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্যে মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِي – ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা।—(মাযহারী)

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ শেরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শেরকেও যুক্ত করে দেয়। তাই শেরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরেকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে যে, আল্লাহ্‌র রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে ঃ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ — অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্‌র রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার—মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্‌র রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্যে মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্‌র আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেযগারদের জন্যে পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত ভাল?

অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮তম আয়াতে নূহ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ –এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল-ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যেই তাদের মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আলেমুল-গায়ব' (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়ব হতে পারে না।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপকসংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়ত ও রেসালত প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই أَهْلِ الْقُرَىٰ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন অজ

গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।— (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখশান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে খোদায়ী আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল. কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত ! তাই বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا
فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেয়া হয়েছে। এমন কি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে । কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদের জন্যে এরূপ মর্যাদা নেই।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে আল্লামা তীবী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تكذيب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হল না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেয়া হয় ! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে !

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ, এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেনঃ যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١) اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ (٢) وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٣) وَ
فِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ
صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا
عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٤) وَ
اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ
جَدِيْدٍ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٥)

সূরা রা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে— একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জ্জুর রয়েছে— একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। (৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।— (মাযহারী)

وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ —অর্থাৎ, এ কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে জরুরী। এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরের জন্যেও কোরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মনসুর বলেন ঃ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা রা'দ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুর রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

الٓمّٓرٰ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত খোদায়ী ওহী ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহ্‌র কালাম এবং সত্য। কিতাব বলে কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কোরআনকেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু واو عطف এবং অক্ষরটি বাহ্যতঃ বোঝায় যে, কিতাব এবং الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর অর্থ এ ওহী যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসেছে। কেননা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য

এতটুকু যে, কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যেই নামাযে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সেমতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ,তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নীচে তারকারাশীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার । উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয় ; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে ; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ –অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কেয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজীর দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্যে গর্ববোধ করে ; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বোঝে নেয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। পার্থিব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলা এজন্যে কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কেয়ামতে বিশ্বাসী হও।

কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্টরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্যে এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্যে কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত সওয়ার ও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের-ফসলের দু'দু প্রকার সৃষ্টি করছেন ঃ লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই বিষয়টি زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেয়া হয়।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ –নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ

অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কাণ্ড উপরে পৌছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে ; যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায় ; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ –নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরাকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুওয়তকে অস্বীকার করত। কোরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্যে বলত এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ ঃ আলোচ্য ৫ নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে ঃ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মো'জেযা এবং নবুওয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে ?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে ; এটা কি সম্ভবপর ? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে. তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে

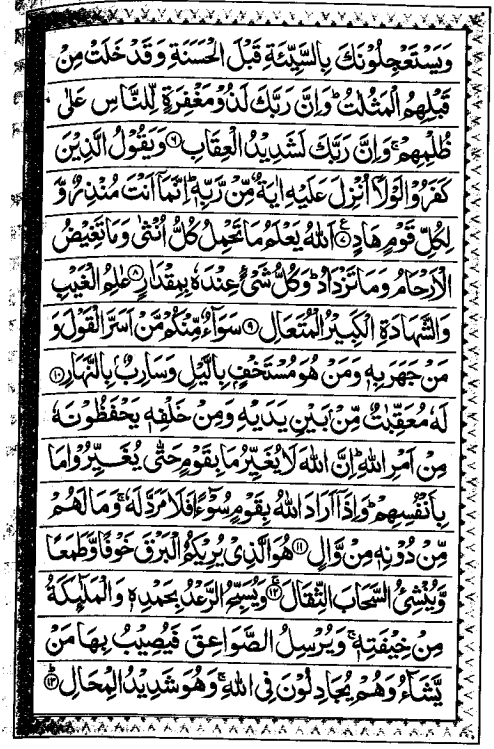

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى
ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ٦ وَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَ
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثٰى وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ٨ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ٩ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ
مَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ١٠
لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ
مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم
مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ١١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ١٢ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن
يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ١٣

(৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। (৭) কাফেররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্র নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন ; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, ; কিন্তু পুনর্বার তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে,প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে ?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেয়। অতঃপর কেয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগমীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু'ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তাআলার আজ্ঞাধীন।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন যে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না ; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই ঃ যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬ নং আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে ঃ

"তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلة —এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে ঃ নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ্ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্যে তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রসূল (সাঃ)-এর অনেক মু'জেযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জেযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেয়া হয়েছে ঃ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"কাফেররা আপনার নবুওয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জেযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জেযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা—মু'জেযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ —অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জেযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা যখন যে ধরনের মু'জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বর আসা কি জরুরী? আয়াতে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক কওমের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লেখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপমহাদেশেও কোন নবী-রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়তে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে ঃ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ..... عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ—তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে— তাও আল্লাহ্ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে—এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশী নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই জানেন যাকিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَغِيضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تزداد শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশী এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়ন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيضُ الْأَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত।

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশীও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্ তাআলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিযিক

পাবে—এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঐসব বস্তু বোঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত ; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شهادة হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লেখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং متعال এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরেকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্যে মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্যে বার বার বলেছে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এবং তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

سرارا শব্দটি سرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলার এবং جهر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্যে যে কথা বলা হয়, তাকে جهر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্যে বলা হয়, তাকে سر বলে। مستخف শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سارب এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়। مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ –এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ – এর অর্থ পশ্চাদ্দিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بامر الله কোন কেরাআতে এ শব্দটি بامر الله বর্ণিতও আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ফেরেশতাদের দু'টি দল হেফাযতের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্যে এবং একদল দিনের জন্যে। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বোঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্যে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী হয়ে যায়, তখন হেফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ওসমান গণী (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীর কতৃক বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হেফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাযত করাই নয় ; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখে দেয়। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফেরেশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন ঃ মানুষের উপর থেকে খোদায়ী হেফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হেফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ
لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ
وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ
اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا
وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا
كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ
اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا
يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

(১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না ; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায় ; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছাবে না। কাফেরদের যত আহ্বান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৬) জিজ্ঞেস করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন : আল্লাহ্। বলুন : তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন : অন্ধ চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলোর সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন : আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তাআলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ
بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য,) যখন আল্লাহ্ তাআলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে ; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্যে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

অর্থাৎ,আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্যে ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্ তাআলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ্ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ্ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ্ পাট করার অর্থ ঐ তসবীহ্ যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্ শুনতে সক্ষম হয় না। ==

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট

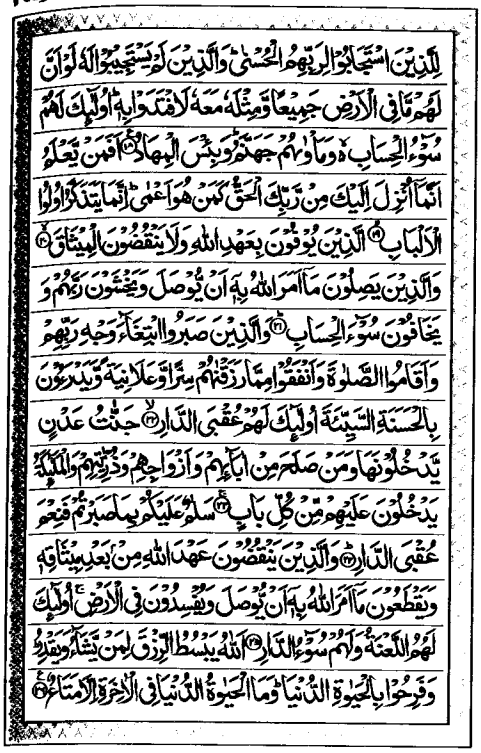

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ
لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾ أَفَمَن يَعْلَمُ
أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এব কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি,তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে: তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। (২৫) এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিবজীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।

ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ – এখানে صواعق শব্দটি صاعقة এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ এখানে محال শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে ; অথচ আল্লাহ্ তাআলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত : উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্যে আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায় ; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।—(জালালাইন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ —অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বোঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। অন্মমধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ —অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল : بَلَىٰ অর্থাৎ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি—বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ —অর্থাৎ, তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তাআলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ্

তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই ঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ —অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خشية শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়।

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ —অর্থাৎ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যদি কৃপাবশতঃ সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ বা ত্রুটি করেননি ? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই ঃ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া ; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করা হয়। (এক) صبر على الطاعة অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صبر عن المعصية অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বে-সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তাআলা দেন না।

সপ্তম গুণ হচ্ছে ঃ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ —'নামায কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা—শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যেই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণতঃ اقامة صلوة শব্দ সহযোগে দেয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে ঃ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজেরই দেয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদ্কা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয় ; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়—যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদ্কা-খয়রাত গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদ্কা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে এবাদত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে বলেন ঃ পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ দার শব্দের অর্থ এখানে دار آخرت অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে, جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عدن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্যে আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে ঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টি সূচনাকালে আল্লাহ্র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কা

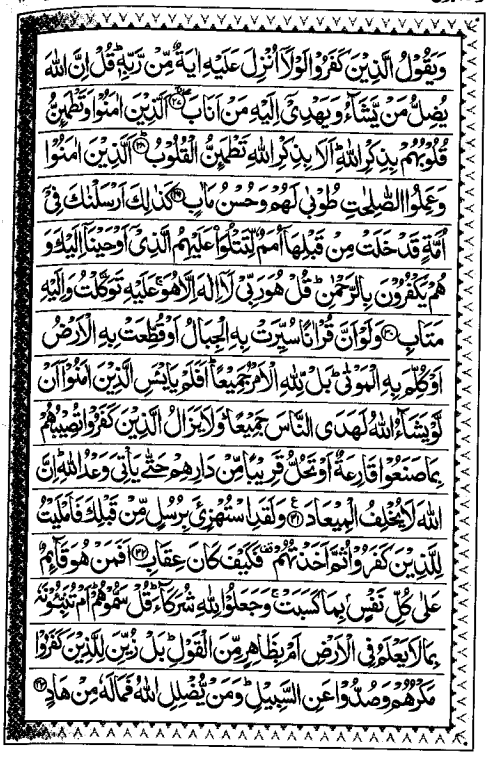

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي
أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ
هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن
لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ
عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(২৭) কাফেররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন ঃ তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্র হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

থেকে নেয়া হয়েছিল। কাফেরও মুশরেকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্র মোকাবেলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরী করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কলেমায়ে তাইয়্যেবা- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ্' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ অথবা রসূলের কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ —অর্থাৎ, তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বোঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক চিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় স্বভাব এই ঃ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বাভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু'স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্ তাআলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ —অর্থাৎ, তাদের জন্যে লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নেয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত ; অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরেকরা পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে

উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল ঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ–বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জেযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন—যাতে মক্কার যমীন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আঃ)–এর জন্যে পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্যে তদ্রূপ করে দিন—যাতে সিরিয়া ইয়ামনের সফর আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্যে আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন—যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম ইবনেমরদুওয়াইহ্)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

এখানে تسيير جبال বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। حرف شرط ـ لو এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে ; অর্থাৎ لَمَا اٰمَنُوْا যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমনসব মু'জেযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জেযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জেযা। শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরেকদের এসব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তাআলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্ তাআলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত ; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবী পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا

– ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জেযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরেকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব

ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ قارعة শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারও উপর বজ্র পতিত হয়েছ এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ -অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ —অর্থাৎ, আপদ বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা আপদ-বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্ তাআলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ —অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্ তাআলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই ; এর পূর্বেও অপরাদের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ
بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَاۤ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ
اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ
بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ
وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ
وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্যে আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র এবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী। (৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি- আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী-রসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ নয় বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়েছে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি; (অর্থাৎ, আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব। তিনি আরও বলেন ঃ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্যে দণ্ডায়মানও হই ; (অর্থাৎ, এমন নই যে, সারারাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ, কোন রসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন।

কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবী করেছে, তন্মধ্যে দু'টি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। (এক) আল্লাহ্‌র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লেখিত আছে যে, ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ, আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিদান পরিবর্তন করে দিন—আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

(দুই) পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জেযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জেযা দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জেযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে اٰية শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ, কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জেযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জেযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তাআলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জেযা প্রকাশ করেন। তফসীর রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, عموم مجاز এর ফায়দা আনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জেযা দাবী করাও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জেযা প্রদর্শণ করবেন।

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ এখানে اجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كتاب শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক

বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জেযা প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জেযা দেখান— এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রেসালত ও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ এখানে اُمُّ الْكِتٰبِ এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে-মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্ তাআলা সৃচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ –অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ –ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জানার জন্যেই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যেই এটা মিঠানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (ইবনে-কাসীর)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ —এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্যে তো এটাই যথেষ্ট যে, অপানি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسَبْعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾

(৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্‌র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাফেররা বলে : আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন। আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫২ ॥

(১) আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি— যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন— পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ্ ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব; (৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। (৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫)আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি ; অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্‌র হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা ইবরাহীম

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা— 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুওয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ —ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هذا এর خبر সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (এক) এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ, একে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেছেন। (দুই) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نور বলে ঈমানের আলো বোঝানো হয়েছে। এজন্যেই ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। অমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رب শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়া—আল্লাহ্ তাআলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবানী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকত্বের কারণে

মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন।

الٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে ঐ পথ বোঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এপথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ্ তাআলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ —অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই। وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ - ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধানবাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে—তেলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যেই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জেযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই ; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেয়ার জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ঃ তৃতীয় অবস্থা وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। (এক) তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে-কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

(দুই) তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা এখনও ভ্রান্তিবশতঃ এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ —উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন, ইমামুল -আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও সরীয়ত দান করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী

উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাযিল হল? একটু চিন্তা–ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। (এক) প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম যা বিজাতি এবং কোরআন–অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবৈধ পন্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি–বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)–এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পন্থাকে কোন স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বোঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এর জন্যে বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথমতঃ আরবী ভাষা ঊর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে–মাহ্ফুযের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত ঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী।

তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আঃ)–এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যাও, যা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আঃ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্বান গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জ্বিন ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট সূরা–বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্র কালাম এবং আল্লাহ্র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহ্র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবতঃ আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহ্র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্যে অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশেই পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর–জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, সুদান, মৌরিতানিয়া, মিসর, ইরাক—এসব দেশের কোনটিরই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো অরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্যে পছন্দ করেন এবং রসূল (সাঃ)–কে সর্বপ্রথম তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন

ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর জন্যে নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজীর ইতিপূর্বে আসমান ও যমীন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নজীরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্যে নিযুক্ত করেন এবং বলেন ঃ بلغوا عنى ولو آية অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত হয়নি, কোরআনের আওয়ায প্রাচ্য-প্রাতীচ্য নির্বিশেষে তদানিন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলা তকদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)–এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজীর জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি ; বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্দ হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি মানুষের সুবিধার জন্যে পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি—যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তাআলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি মূসা (আঃ)–কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহের অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

ايات —আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জেযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আঃ)–কে আল্লাহ্ তাআলা ন'টি মু'জেযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ –এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আঃ) শুধু বনী-ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰمِ اللّٰهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)–কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান।

আইয়্যামুল্লাহ্ ঃ ايام শব্দটি يوم –এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। ايام الله শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন— বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহ্র অপর অর্থ আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণতঃ এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আঃ)–কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'যেজা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। (এক) শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং (দুই) নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান করা وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰمِ اللّٰهِ বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জেহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্র যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহবান করুন; উদাহরণতঃ তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্যে মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝٦ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧ وَقَالَ
مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٨ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا
أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٩ قَالَتْ رُسُلُهُمْ
أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠

(৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেনঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর— যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মূসা বললেনঃ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার (৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে–নূহ্, আদ ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছেঃ যা কিছুসহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ —এখানে **آيات** –এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। **صبار** শব্দটি **صبر** থেকে **مبالغة** –এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। **شكور** শব্দটি **شكر** থেকে **مبالغة** –এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৬ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী–ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে মূসা (আঃ)–কে আদেশ দেয়া হয়।

মূসা (আঃ)–এর পূর্বে ফেরাউন বনী–ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে –সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন–পালন করা হত। মূসা (আঃ)–কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা বনী–ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

تاذن —শব্দটির অর্থ সংবাদ দেয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নেয়ামত–সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নেয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় নেয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ যদি তোমরা আমার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ

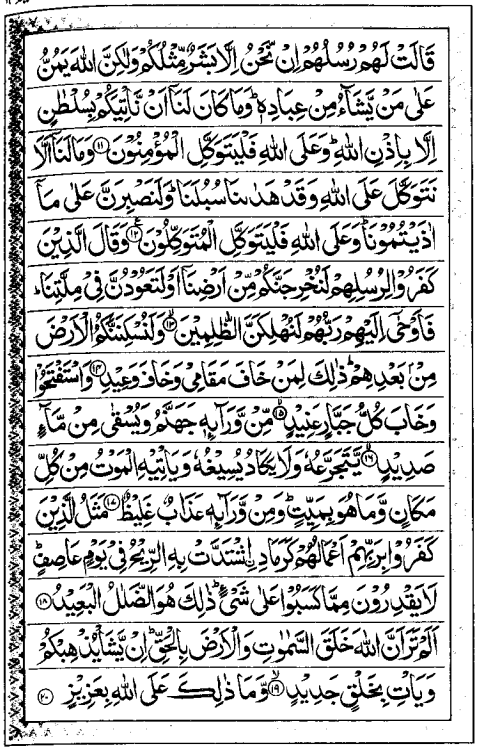

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَمَا لَنَا أَلَّا
نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا
آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢) وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) وَاسْتَفْتَحُوا
وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ
صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧) مَثَلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨)
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠)

(১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন ঃ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। (১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

দুনিয়াতেও নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যেন, নেয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রতিদান, সওয়াব ও নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَأَزِيدَنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্যে তাকিদ সহকারে لأعذبنكم (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে—এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ ....

অর্থাৎ, মূসা (আঃ) স্বজাতিকে বললেন ঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যেই। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্যে নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্যে।

ইতিপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোন কাজে লাগাতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

— উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا
كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ۭ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ سَوَاۗءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ
اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ
لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا
تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ
اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۭ
تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاۗءِ ۝
تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيْثَةِ ۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

(২১) সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম—অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি—সবই আমাদের জন্যে সমান—আমাদের রেহাই নেই। (২২) যখন সব কাজের ফয়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। এতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মুমিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিস্মাৎ হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্য নির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়—সবাই জানে।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্যল তথা মাকাল বৃক্ষ।— (মাযহারী)

মুসনাদ আহ্মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন ঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মুমিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন্ বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন ঃ আমার মনে চাইল যে, বলে দেই—খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মান ও কোন কিছুর পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে اَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কোরআন বলে ঃ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ —অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তাআলার যেসব যিকির, তসবীহ্-তাহ্লীল, তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায়

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ
اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ
مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا
سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

(২৭) আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে—(২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস। (৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্যে সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন ঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪) যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন ঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।

এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্যে উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ বাক্যে اكل শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حين শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত ঃ এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কলেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈমান, তেমনি কলেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বেল্লোখিত হাদীসে كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ অর্থাৎ, খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হান্‌যল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। (এক) কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। (দুই) দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। (তিন) বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মুমিনের ঈমান ও কলেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

—অর্থাৎ, মুমিনের কলেমায়ে-তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তাআলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কলেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কলেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কলেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবেলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কলেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ, 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শাস্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্র সমর্থনের বলে এই কলেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ –এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التثبيت عند التبييت এবং شرح الصدور এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং এ পরীক্ষার সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বোঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জ্বিন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভিষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পরজগতে পৌঁছার পর আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নেয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যা চান, তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কাব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা আরও বলেন ঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۭ وَبِئْسَ الْقَرَارُ

—অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহ্র নেয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নেয়ামতসমূহও; যেমন, ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীকরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নেয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্যে কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্র মহান নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ اَنْدَادًا শব্দটি نِد –এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে انداد বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تمتع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ "মক্কার কাফেররা তো আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে" আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বন্দাদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুষ্ঠু

নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলেম বলেন ঃ ফরয যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত—যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত—যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত খতম হয়ে যায়—ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ এখানে خلة শব্দটি خلال এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে باب مفاعله এর ধাতুও বলা যায়; যেমন قتال ও دفاع ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তির পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্ তাআলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশতঃ বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফ্ফারার জন্যে কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যতঃ হাশর ও কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দ্বীনের কাজের জন্যে হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ্ তাআলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ —অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অনেকগুলো নেয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে এবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। ثمرات শব্দটি ثمرة –এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمرة বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ —সবই ثمرات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে।—(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহ্র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سخر শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ্ তাআলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি دأب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্ তাআলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জীর অধীন।

এমনিভাবে রাত দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাভী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই।

কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে অথবা সারা বিশ্বের জন্যে কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্যে অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে শুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তাআলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নেয়ামত মনে করা হয়, নেয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নেয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য এবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তাআলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ্ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন ঃ الان قدشكرت يادارد অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্যে যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ অর্থাৎ, মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নেয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের গুণ صَبَّارٍ شَكُورٍ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া ঃ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا —অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাক্বারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি الف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহ্ও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বরাত দিয়ে ইসমাঈল (আঃ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে এবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না, বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহর এবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।